উপসংহার

'কালকূট'-এর রচনার বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যে ভাবে বিভাজন করা হয়েছে সেগুলোকে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই রচনা গুলোর শিল্পরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে এই গবেষণার কাজটি করা হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপচিত্র নিম্নে দেওয়া হল।

ভূমিকায় উল্লেখিত অধ্যায় ধরেই এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল— প্রথম অধ্যায়ে 'কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়' দেওয়া হয়েছে। 'কালকূট সত্তা'র আত্ম প্রকাশের পূর্বে সমরেশ বসুর লেখক সত্তার প্রকাশ ঘটে। এই 'সমরেশ বসু'ও 'কালকূট' দুই ভিন্ন সত্তা কিভাবে লেখার মধ্যে দিয়ে কাজ করে গেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে তেমনি ব্যক্তিজীবনে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে গঙ্গার স্রোতধারার মতো কলমের ধারায় কথার জাল বুনে বিচিত্র পটভূমি, বিচিত্র ভাবনা, জীবনের ভাঙাগড়া, সুখ দুঃখের খুঁটিনাটি চিত্র নিপুণ ভাবে এঁকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে বিশেষ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানই নানা ভাবে বিভিন্ন পট পরিবেশের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। ছোটবেলা থেকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ মিশুক স্বভাবের জন্য যে কোন পটপরিবেশে মিলে যেতে পারতেন। তিনি ছিলেন আশ্চর্য গল্পবলিয়ে। মায়ের কাছে পৌষের নিশাকালে শোনা ব্রতকথা পরদিন বন্ধুদের কাছে বলতেন কল্পনার রঙ মিশিয়ে। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল 'সুরথনাথ'। সুরথনাথের বাবার উদাসীনতা, সংসার বৈরাগ্য সব কিছুই বালক সুরথনাথকে প্রভাবিত করেছিল। এবং কিভাবে সুরথনাথ 'সমরেশ বসু' হয়ে গেলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমরেশ বসু 'কালকূট' নামে পরিচিত হয়ে ধীরে ধীরে জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গেলেন, এসবই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি গৌরীদেবীর সঙ্গে প্রেমের উন্মাদনায় তিনি সতের বছর বয়সে নিজ ছাত্রজীবন শেষ করেছিলেন। এবং কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'পার্টির পোষ্টার লেখা' ও হাতে লেখা লিপিকারের মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করেছিল। এসবই উঠে এসেছে আলোচনায়। ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' পরিচয় পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এবং তার প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যদিও তার প্রথম লিখিত উপন্যাস ছিল 'নয়নপুরের মাটি' ছদ্মনামে 'ভোটদর্পণ' নামে একটি রাজনৈতিক রচনা লিখেছিলেন। এরপরে ১৯৫৪-তে আনন্দবাজার পত্রিকায় রিপোর্টারের কাজ নিয়ে ফটো সহ মেলার ধারা বিবরণী

পাঠানোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল 'সমরেশ বসু'র অন্য এক ধারায় পথ চলা। পুরাণ-ইতিহাসের স্মৃতি বিজরিত সারাভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভাষা পোশাক-খাদ্য-ধর্মীয় আচরণ তার হৃদয় উন্নীতে মহামিলনের সুর তুলেছিলেন, তার পূণ্যস্নান করতে গিয়ে ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল শতশত মানুষ, তাদের চিতার আগুন আকাশ স্পর্শ করেছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের চিত্র তারমধ্যে ভেসে উঠেছিল, তাঁর হৃদয় মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁর 'বিষবাহী' প্রাণের 'অমৃতের পরশ পেতে লিখেছিলেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', নয়টি কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ছদ্ম নামে। 'কালকূট' ছদ্মনাম নিয়ে সমরেশ বসু তার ছেলে বেলার 'উদাসী বাউল' সত্তা 'সুরথনাথ- এর মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এক নতুন রচনাশৈলীতে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশিত হয়েছিল 'কালকূট' নামে। 'সমরেশ বসু' সৃষ্ট তার দ্বিতীয় 'সত্তা' কালকূটের রচনা শৈলী সমরেশ বসুর রচনাশৈলী থেকে আলাদা। একই কলমের দ্বৈতধারা। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র প্রভূত সাফল্যের সাথে সাথে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল— এগুলোই বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া একই উৎস থেকে দুটি ধারার রচনাগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। সমরেশ বসু জীবনীমূলক উপন্যাস, 'দেখি নাই ফিরে', রামকিংকর বেইজকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি, অসময়ে ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। এই রচনাটিতে 'সমরেশ বসু' ও'কালকূট', দুজনে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলতে শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঃ 'কালকূটের রচনাবলীর বিষয়গত শ্রেণীকরণ' কালকূটের সমগ্র রচনা ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে কতগুলি বিষয় নজরে এসেছে বিষয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী রচনা গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন— ১. মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনা ২. ইতিহাস-পুরাণ মহাকাব্য কেন্দ্রিক রচনা।

এই মূল দুটি ভাগের মধ্যে রচনা গুলিতে বিষয়গত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরও নানা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে যেমন, কালকূটের মানব জীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে আছে। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, খুঁজে ফিরি সেই মানুষ, আরবসাগরের জল নোনা, নির্জন সৈকতে, সবই শিখর প্রাঙ্গনে, কোথায় পাবো তারে, পিঞ্জরে অচিন পাখি, হারায়ে সেই মানুষ, মন চল বনে, বনের সঙ্গে খেলা, প্রেম নামে বন, তুষার সিংহের পদতলে, ঘরের কাছে আরশিনগর, মুক্তবেণীর উজানে, চল মন রূপনগরে, পণ্যভূমে পুণ্যস্নান এবং 'পূর্ণকুম্ভ, পুনশ্চ' ইত্যাদি।

এই মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি উপবিভাজনে বিভাজিত করা হয়েছে। ক. লক্ষ্য রূপের আরশিতে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ খ. প্রকৃতির টানে ঘর ছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ ও গ. বাউলের সহজিয়া সাধনায় মানব মনের তত্ত্বতালাশ।

তৃতীয় অধ্যায় : মানবজীবন কেন্দ্রিক রচনা— এই অধ্যায়ে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে লক্ষ রূপের আরশিতে মানবজীবন অন্বেষণ এই পর্বে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'— এই কাহিনীতে আলোচনা করা হয়েছে প্রয়াগের মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে জীবনকে তিনি কিভাবে দেখেছেন। লক্ষ রূপের হাটে যে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সেই মানুষগুলোকে নিয়েই, তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী দিয়ে কাহিনীর মালা গেঁথেছেন। ট্রেনে যেতে যেতে কুম্ভস্নান অভিলাষী যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল, প্রয়াগে তার পৌঁছানো হয়নি। ট্রেনের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল বলরাম, শ্যামা, প্রেমবতীয়া। স্টেশনের বাইরে ইন্‌জেকশন নেওয়ার সময় দেখেছিলেন প্রহ্লাদ, দিদিমাকে। দিদিমার বদান্যতায় কালকূটের তাঁদের তাঁবুতে থাকবার জায়গা হয়ে যায়। বলরাম কেদিন লেখক কালকূটকে শ্যামাদের তাঁবুতে নিয়ে আসে। এরপরে বারে বারে শ্যামার সঙ্গে যমুনার তীরে নিয়ে যায়। বলেছিল, কেন্দে ফিরতে চায় তাকে কেন্দেই ফিরতে দিন, যমুনার তীরে সেই দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করবে। এইভাবে শ্যামা-কালকূট একটা মানসিক সম্পর্কের বন্ধনে ধরা পড়েন। এই কাহিনীতেই উঠে এসেছে প্রহ্লাদের বালিকা বধূ 'ব্রজবালা'। লেখকের চোখে সে হয়ে উঠেছে ব্রজবেশিনী মঙ্গলচারিণী নারী। আর দিদিমার ছায়ায় কালকূটের তাঁবুতে কটা দিন কেটেছিল। কাহিনী উঠে এসেছে প্রেমজীদাসী রঘুনন্দনের স্বর্গীয় প্রেমকাহিনী, পাঁচবদ্যির হারিয়ে যাওয়া মেয়ে শিউলির কথা। রাত্রিশেষের অন্ধকারে গঙ্গাতটে দেখেছেন গৃহী অবধূত পরিবারের বন্ধন মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, আবার দেখেছেন বালুচরের নিশিকে, আবছা ছায়া-ছায়া মূর্তি লেখক কালকূট তারা দেখছে আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ নরনারী আর সাধু-সন্ন্যাসীদের। মেলার শেষদিনে পুণ্যস্নানে গিয়ে অনেকেরই আর ফেরা হয় নি। ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল শত শত লোক। চিতার আগুন প্রয়াগের আকাশ স্পর্শ করেছিল। লেখক কালকূটের মনে প্রশ্ন? কার ক্রোধের ফলে শত শত লোকের প্রাণ গেল। কথার ফুলবাগানের মালী চিতার আগুনেই শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্মীদাসী চিতার আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। আগুন নেভে না কিন্তু তাদের চলে যেতে হয় ঘরে ফেরার গাড়ি ধরার জন্য। ট্রেনে শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়, নতুন বিধবা। শ্যামার সতীন জানায় 'আমার বুঢ়াটা' মরে গেল ভাই। শ্যামা জানায় বলরামকে সে একটা আংটি দিয়েছিল, কালকূট শ্যামার মুখে একটা প্রশান্তির ছাপ দেখেছেন। শ্যামারা পাটনায় নেমে যায়। কালকূট নিজের জায়গায় ফিরে আসে। লক্ষ রূপের মধ্যে থেকে কালকূট রূপ বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করেছেন, নিজেকে খুঁজেছেন। কাহিনীটিতে কালকূট বহুরূপের মধ্যে নিজেকে, মানুষের আন্তররূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাহিনী উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক সেটাই দেখা হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে 'পুণ্যভূমে পুণ্যস্নান'। সোনপুরে হরিহরছত্রের মেলায় পশু

বিক্রি হয়। পৃথিবীর অদ্বিতীয় পশুমেলা এটি। তাঁর পরিচিত প্রবাসী লেখক বন্ধু তাঁকে লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পড়ন্ত জমিদারির উত্তরপুরুষ সিংবাহাদুর সাহেব। লক্ষ্ণৌর খানদানি মানুষ। উঁচু মনের, দিলখোলা মানুষ সপরিবারে চলেছেন সোনপুরের মেলায়, ক্রেতা হিসাবে নয়, 'লছমীপিয়ারী ও সূরয' নামে হাতী দুটিকে বিক্রি করতে। হাতী বিক্রি করে দিতে হবে জন্য সবার মন খারাপ, কিন্তু বিক্রি না করে উপায় নেই। ট্রেনের মধ্যে দেখলেন পবননন্দন চালচুলো ভবঘুরে। চেহারায় যার গ্রীক সৌন্দর্য। তার সঙ্গে সোনপুরের পশুমেলা দেখেন। ওর চোখ দিয়ে পশু বিক্রির গোপন সংকেত দেখেন, পশুদের দীর্ঘশ্বাস শোনেন। মীনাবাজারের মেয়েদের দেখেন, নিজের পরিবারের বাবা-স্বামী-ভাই কীভাবে মেয়েদের বিক্রি করে দেন সেটা পবননন্দন জানিয়ে দেয়। সত্যেনবাবু রেলকোয়ার্টারে অনেক লেখক-গুণীজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। কুসুমের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে কালকূটকে ইতিহাসের আলোকে সোনপুরের মেলার কথা, মন্দিরের ভাস্কর্যের কথা শোনায়। আর গায়ত্রী নদীর কাছে বসে কালকূটকে তার ধর্ষিতা হওয়ার কাহিনী শোনায়। 'বলির মাংস' বলে সবাই তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। কালকূটের সঙ্গে হাজিপুর থেকে অধ্যাপক মিশ্র এসেছিল তার মুখেও সেই 'বলির' কথা! কুসুমের সঙ্গে কালকূট প্রীতির সম্পর্কে বাধা পড়ে। কালকূট তাঁকে আত্মহননের পথ থেকে আলোর পথে যেতে বলেন। বুদ্ধের শরণ নিতে বলেন। কুসুম কালকূটের কথায় বাঁচার পথ খুঁজে পায়। কুসুমের দেওয়া কুসুম ফুলের গাছটি কালকূট বাঁচাতে পারেন নি। পবননন্দন কালকূটকে না জানিয়েই চলে গেছে, এই বিশ্বপ্রকৃতিই ওর! এই কাহিনীকে ভাষা নৈপুণ্য কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্রগুলোর কথাবার্তা কতটা সাহিত্যধর্মর আর কতটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে কিনা সেটা দেখা হয়েছে।

এরপর 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়াগের কুম্ভমেলার ৩১ বছর পরে আবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গেছেন। বুকে তার রোগের ছোবল বলে তিনি এবার ৩১ বছর আগের মত মনজোয়ারে ভাসতে পারেন নি। এই কাহিনীটি অনেকগুলো উপন্যাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। দিনলিপির আকারে লিখে গেছেন। 'কুম্ভমেলা' উপনামটিতে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠানো দুটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়েছে, ৩১ বছর আগের কুম্ভমেলাকে জানবার জন্য। লক্ষ রূপের হাটে তিনি বহু মানুষকে দেখেছেন, তাদের তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিত্রিত করেছেন। মাঝে মাঝে অতীতচারী হয়ে মহাভারতের গঙ্গাদ্বারে স্নান, অমৃত উত্থানের কাহিনী আরও মেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে দিয়ে 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' কাহিনীটি রচনা করেছেন। দিনলিপির আকারে লেখা কাহিনীটি উপন্যাসের সম্পূর্ণতায় আসতে পারেনি এ'কথা এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

'হারায়ে সেই মানুষে' এটি একটি নাতিদীর্ঘ রচনা। লেখক কালকূট তার বাল্যকালের স্মৃতিতে

কাহিনীটি সৃষ্টি করেছেন। এতে কতকগুলো ছোট ছোট বালক বালিকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করা আছে। এর সঙ্গে উঠে এসেছে তার বালকমনে কিছু নিষেধ না মানার কাহিনী। কয়েকদিনের জন্য দিদির শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সকলের মন জয় করে ফিরে এসেছিল। বহু শিশুর মনোলোক চিত্রিত হয়েছে এতে। এই কাহিনীর ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। লেখকের লেখনীর গুণে চরিত্রগুলো বাস্তব রূপ পেয়েছে।

'মুক্তবেণীর উজানে' এই কাহিনীটি আলোচনা করা হয়েছে এরপর। কালকূট ত্রিবেণী যাওয়ার পথে জাফর আলির মসজিদে গিয়েছিলেন। সেখানে জাফর আলির বংশধর এমদাদ আলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। টিলার ওপর থেকে তিনি ত্রিবেণীর মুক্তবেণীকে দেখেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় ফিরে গিয়ে বর্তমানে ত্রিবেণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছিলেন। টিলা থেকে নেমে এসে এক অভিনব শবযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। চার খাটের ওপর মহিলা একটি শবদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শবদেহ বইতে পারছিল না, তাই কালকূটকে কাঁধ দেওয়ার জন্য বারে বারে অনুরোধ করেছিল। অগত্যা কালকূট কাঁধ দিয়েছিলেন। কার মড়া, মড়াটি কে কিছুই জানা ছিল না। পরে জেনেছিলেন ওরা বারবনিতা। ত্রিবেণী ঘাটে শবদেহ নিয়ে পৌঁছানোর পর তারা গোরা চক্কোত্তির বাড়িতে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিল। গোরা চক্কোত্তির বাইরের আচরণে কঠিন, ভিতরে একটি দিলখোলা শিশু। তার কলেজে পড়া মেয়ে তাকে কালকূটের ছবিসহ একটি পত্রিকা দেখিয়েছিল। মেয়ে কূলকূটকে চিনতে পেরেছে সেই গরবে বাবা গর্বিত।

গোরা চক্কোত্তি জানিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে তাকে ক্ষ্যাপাবাবা দেখা করতে বলেছেন এ'কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কালকূটকে ত্রিবেণীর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন, গাড়ী না পেলে তিনি যেন তাদের বাড়িতেই চলে যান এ'কথা বলেছিলেন। শ্যামাক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে দেখা করে তিনি তাদের নৌকাতেই রয়ে গেলেন। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে তিনিও নৌকাতেই যাবেন। নৌকায় উঠে তিনি আর এক নতুন জীবনকে চিনলেন। ক্ষ্যাপাবার আশ্রমের সংসার। তিনি হারমোনিয়াম বাজান আর গলায় সাপ পেঁচিয়ে রাখেন। তার আশ্রমের সংসার হল অনাথ আশ্রম। গঙ্গা, যমুনা তার এই কন্যাই কুড়িয়ে পাওয়া। রতনও তাই। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তার একটি কাজ।

রাতে গঙ্গা-যমুনার সুমধুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখেন জোয়ারে তারা অনেক দূরে চলে এসেছেন। ক্ষ্যাপাবাবা কালকূট তাঁদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। তিনদিন থেকে যেতে হল ক্ষ্যাপাবাবার নির্দেশে। আশ্রমে থেকে জানলেন আশ্রমের সংসারের জীবন। ক্ষ্যাপাবাবার 'সিদ্ধিলাভে'র স্থানটি গঙ্গা দেখিয়েছিল। বিশাল গাছের ছায়ায়, যেখানে দিনের আলো ঢোকে না সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বলেছিল সে বিয়ে করে ঘরসংসারী হতে ভয় পায়। সংসারে কখনও থাকেনি বলেই তার এই ভয়। এ'কথা বলেই গঙ্গা হাঁটতে শুরু করেছিল। কালকূট ত্রিবেণী

সঙ্গমে এসেও ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে থেকে এই অনুভবে পৌঁছে যান জীবন এক বহতা নদীর মতো চলমান মানবস্রোতে তিনি ভেসে যান।

প্রকৃতির টানে ঘরছাড়া কালকূটের মানবজীবন অন্বেষণ :

বনপর্ব : এই পর্বে আলোচনা করা হয়েছে বন পর্বের একটি রচনা 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন'। এই তিনটি রচনা একে অপরের পরিপূরক। 'মন চল বনে' এই রচনাটিতে লেখক কালকূট ট্রেনে করে জরাইকেলা যাচ্ছেন। ট্রেনের মধ্যে যশোরিয়া টানের মানুষ গাঙ্গুলিমশাই-এর সঙ্গে বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। তার কাণ্ড দেখে তাঁর ছেলে শিবু, মেয়ে তিপু ও তার স্ত্রী কখনও চোখে চোখে, কখনও মুখটিপে হেসে যাচ্ছিল। পরিচয় হওয়ার পরে জানতে পারেন তিনি যাদের বাড়ি যাচ্ছেন তারা তার পরিচিত। এবং 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। বনের প্রান্তসীমায় জরাইকেলা। যে বাড়িতে তিনি উঠেছেন সেই বাড়ির ছেলে নিতু কালকূট বন সম্পর্কে, বনবাসীদের সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিপু ও নিতু তাকে কোয়েনা নদী ও সায়টা নালা, বনের গাছপালা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। জরাইকেলা থেকে মোহনবাবু ও সুরীনের সঙ্গে ছোটনাগরা যান। পথে যেতে যেতে শুক্রম, সোমারি ও তার শালী সুরসতিয়াকে দেখে মোহনবাবু ধমকে গাড়িতে তুলে নেন কাজ করার জন্য। ছোটনাগরায় নার্স তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়। তৃপ্তি ভৌমিক কালকূটকে বনভূমি ঘুরিয়ে দেখায়। বনের গাছপালা, বনবাসীদের অসুখবিসুখ সম্পর্কে অবহিত করে। তৃপ্তি কালকূটের সঙ্গে এদেলবায় যেতে চায় কিন্তু কর্তব্যের টানে সে যেতে পারে না। তাঁর চোখে জল এসে যায়। কালকূট এদেলবার পথে রওনা দিয়ে দেন। রক্তকুসুম গাছের নীচে তৃপ্তি ভৌমিক দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে 'বনের সঙ্গে খেলা'র। ছোটনাগরা থেকে লেখক কালকূট রেঞ্জার বদরিকা প্রসাদের সঙ্গে গভীর অরণ্যকে দেখতে দেখতে ও কোয়েনার কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে এদেলবায় পৌঁছে যান। সেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষকে কাটা, টেনে এনে গাড়িতে তোলা সবই প্রত্যক্ষ করেন এবং ভূলুণ্ঠিত বৃক্ষগুলিকে দেখে বেদনার্ত হন। বনবাসী ও বনবাসিনীরা সবাইকে কাঠ কাটতে দেখে। বনকন্যা সুসতিয়ার সঙ্গে আবার ওই বনভূমিতে দেখা হয়ে গেল! ভূপতিত গাছের ফাঁক দিয়ে যখন সে বেরিয়ে এসেছিল মনে হয়েছিল জীবনবৃক্ষ। বনভূমি আর বনকন্যা রঙ রূপে একাকার। সন্ধ্যাবেলায় পাতার কুটিরে 'গুইয়ো' তে আবার সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কালকূট তাদের সঙ্গে ডিয়েং পান করেন ও নাচে অংশ নেন। এইভাবেই লেখক কালকূট বনপ্রকৃতির বনবাসী মানুষজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে খেলতে আসেন। বনের প্রান্তসীমায় যে ছিল নবজাতক 'এদেলবার' বনভূমিতে সে যৌবনে পদার্পণ করে। পরদিন 'লোরে'র জলে

লেখক কালকূট ও সুরসতিয়া পোশাক উন্মুক্ত করে জল ছিটিয়ে স্নান করে। কালকূট তার সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল তিনি মাতৃপূজায় মেতেছেন। সুরসতিয়া তাঁর দৃষ্টিতে শক্তিরূপিণী মহামায়া হয়ে যায়।

খেলা শেষ, এদেলবার বনভূমি থেকে চলে যাওয়ার জন্য সিংজী জীপ নিয়ে উপস্থিত। সুরসতিয়া ঘুমিয়ে থাকায় সুরীন কালকূটতে ডাকতে দেয় না, তিনি তার 'কালো শীতল দুটি পায়ে' প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেন। হঠাৎ করেই খেলা শুরু হয়েছিল, হঠাৎ করেই খেলা শেষ হয়ে যায়।

ইতিহাস পুরাণ পথে চলতে গিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'বাণীধ্বনি বেণুবনে', 'শাম্ব', প্রাচেতস, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, পৃথা, অন্তিম প্রণয়, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য ও প্রেম কাব্য রক্ত। বাণীধ্বনি বেণুবনেতে তিনি গেছেন জনকপুরে রামের বিবাহের বরযাত্রী হয়ে। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ধীরুমায়া তার সেবা করেছিল। এখান থেকে তিনি চলে যান রাজগৃহে। সেখানে কাহিনীতে এসেছে সোন্‌পাতিয়া, পুরনো মন্দিরের সৌন্দর্য তার দেহে। কালকূট তিনি রাজগৃহের ধ্বংস স্তূপে গিয়ে পুরাণকালের খ্যাতিমান পুরুষদের ছায়ায় ছায়ায় বিচরণ করেছেন। পৌরাণিক ও মহাকাব্যে পথে চলতে গিয়ে কালকূট এক বিখ্যাত সংগ্রামী অভিযাত্রী শাম্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এগুলো চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তমসার তীরে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এক মহান প্রেমিক পুরুষ প্রাচেতসের। যার মুখ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল 'আদিকবি'র প্রথম শ্লোক। পৃথায় তিনি দেখেছেন এক ঐতিহাসিক রাণীকে। আর কুরুক্ষেত্রের শেষ সেনাপতি অশ্বত্থামার শেষ দিনে জ্বলে ওঠার একক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানস চক্ষে। তিনি মহান প্রেমিক সমাজ বিপ্লবী অমৃত পুরুষ চৈতন্যের দর্শনের আশায় মানস ভ্রমণ করে নীলাচল পর্যন্ত। এগুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কালকূটের রচনাগুলোর শিল্পরূপ আলোচিত হয়েছে।